International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-V, Issue-IV, July 2019, Page No. 01-06
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i4.2019.1-6

নারীমুক্তি আন্দোলন ও নারী-নিসর্গনীতিবাদ: একটি আলোচনা

প্রণব কির্তুনীয়া
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, ইটাছুনা, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ

Abstruct

Man and women are two main pillars of the human society. The development of the society is depends on both man and women. The role of women in development is most intimately related to the goal of comprehensive socio-economic development. If the women of the society are neglected and backward, then the society is back in the end. The development of society is actually possible through the development of both men and women. Today we fell the necessity of empower of women in the society. Empowerment was defined as a process of transformation of power relation by which oppressed persons gain some control over their lives and involved in the matters, which affects them directly. Government and non-government organizations helping women to achieve their own rights and to empower themselves. But they are not empowered yet. All efforts of women empowerment are still failling in the society. In this paper I will try to find out the reasons why women is not being empowered, different obstacles of women empowerment, the way for overcoming the obstacles in the case of women empowerment and the theories and methods, those will help us to make a healthy society and pollution free environment.

Keyword: Patriarchy, empowerment, intrinsic value, ecofeminism, deep ecology.

সূচনা: মানুষের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে সভ্য সমাজ। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্করণের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে রীতিনীতি উন্নত হয়েছে মানব সভ্যতা। কিন্তু সমাজে নারীর অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রাচীন যুগে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মনে' বলা হয়েছে – "পুত্র হল সর্বোচ্চ স্বর্গের প্রদীপ এবং কন্যা দুঃখের কারণ।" আবার মনুসংহিতায় নারীর ধন সম্পত্তির অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে এবং নারীকে পুরুষের অধীন করে পুরুষতন্ত্রকে পুষ্ট করা হয়েছে। মনু বলেছেন– "পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে, রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি"। অর্থাৎ স্ত্রীলোককে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবে। অর্থাৎ নারীকে সর্বদাই পুরুষের অধীন রাখা হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নারীর প্রতি বৈষম্যমুলক আচরণ অব্যাহত। নিছক রসিকতা, অস্বস্তিকর মন্তব্য বা আচরণের মাধ্যমে খেলাচ্ছলে নারীকে বিরক্ত করা— আজকাল ইভটিজিং নামে পরিচিত। ইভটিজিং চলছে সকাল থেকে রাত সবসময়, সর্বত্র- ট্রেন, বাস, রাস্তাঘাট, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বস্তির গলি থেকে শহরের রাজপথ। ইভটিজিং ছাড়াও রয়েছে

যৌননির্যাতনের মত ঘটনা যা আজ সামাজিক ব্যাধিতে পরিনত হয়েছে। এছাড়াও পণপ্রথাজনিত কারণে গৃহবধূর স্বামী ও শশুরবাড়ীর লোকজনদের দ্বারা নির্যাতন তো আছেই।

সমাজে নারীর ভূমিকা: নারী ও পুরুষ হল সমাজের মুল দুটি স্তম্ভ, নীতিগতভাবে দুটি স্তম্ভই মুল্যবান। উন্নত সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন সমাজের সব সদ্যসের সার্বিক উন্নয়ন, কেবলমাত্র পুরুষ-সদস্যের উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত সমাজ গঠন সম্ভব নয়। অথচ সমাজে নারীকে সচেতনভাবে পিছিয়ে রাখা হয়েছে, ফলে সমাজও পিছিয়ে পড়ছে। রাষ্ট্র, সমাজ, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সংস্থা নারীর অধিকার ও নারীর ক্ষমতা অর্জন নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণার মাধ্যমে নারীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করছে তথাপিও নারী ক্ষমতা অর্জনে আশানুরুপ সফলতা পায়নি বা বলা যায় নারীর ক্ষমতা অর্জনে সমাজ তথা রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থ। নারীবাদীরা বলেন এই ব্যর্থতার দায় বর্তায় পুরুষতন্ত্রের (patriarchy) উপর। কারণ পুরুষতন্ত্রে মনে করা হয় কেন্দ্রে যার অবস্থান সে উত্তম ও ঠিক, যে প্রান্তে অবস্থান করে সে অধম ও বেঠিক। পুরুষতন্ত্রে পুরুষকে কেন্দ্রে রেখে নারীকে প্রান্তে রাখা হয়েছে। পুরুষের স্বার্থে নারীর মূল্য স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ নারীর নিজস্ব মূল্য বা স্বতঃমূল্য (Intrinsic Value) স্বীকার করা হয় না, তাঁর ব্যাহারিক মূল্য (Instrumental Value) স্বীকার করা হয়। স্বতঃমূল্য বলতে সেই মূল্যকে বোঝায় যা ব্যাক্তির নিজস্ব মূল্য। যেমন যদি আমরা দাবি করি যে x হোল একজন মানুষ এবং তার স্বতঃমূল্য বর্তমান। এক্ষেত্রে x এর মূল্যটি কখনই অন্য কোন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। x অন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজন সাধন করুক বা না করুক x এর নিজ মূল্য আছে। অপরদিকে ব্যবহারিক মূল্য ব্যক্তির নিজস্ব মূল্য নয়,। যার ব্যবহারিক মূল্য স্বীকার করা হয় তার মুল্যটি নির্ভর করে অন্যান্য ব্যক্তির কি পরিমান প্রয়োজন সাধান করে তার উপর। যখন আমরা বলি ছালটির মূল্য আছে, আসলে তখন আমরা বলতে চাই ছাগলটি মানুষের প্রয়োজন সাধন করে সেইজন্য ছাগলটি মূল্যবান। এক্ষেত্রে ছাগলটির স্বতঃ মূল্য স্বীকার করি না বরং পরতমূল্য বা ব্যবহারিক মূল্য স্বীকার করি। পুরুষতন্ত্র পুরুষকে দিয়েছে সভ্যতা সৃষ্টির অধিকার, শক্তির অধিকার, অবদমনের অধিকার। আর নারীকে দিয়েছে প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালন, মায়া-মমতা, সংবেগশক্তি, প্রেম, মৈত্রী প্রভৃতি গুণগুলি অনুশীলনের দায়িত্ব। সমস্ত তত্ত্বের জনকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুরুষকে। এই সব তত্ত্বগুলি পরুষ-পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। ফলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তত্ত্বকাঠামোগুলির দ্বারা পুরুষের স্বার্থ পুষ্ট হয়, নারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। অর্থাৎ সমাজের সার্বিক স্বার্থ ব্যহত হয়।

সমাজে নারীর ক্ষমতায়নে পুরুষতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা আমরা নারীনিসর্গবাদের (Ecofeminism) আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারব। একদল নারীবাদী মনে করেন নারীবাদ (Feminism) ও নিসর্গনীতি (Ecology) পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। নারীবাদের আলোচ্য বিষয় হল নারীর বর্তমান অবস্থান, তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা, কীভাবে নারীর বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব, প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করা যায় কীভাবে প্রভৃতি। এছাড়াও নারীবাদীরা দাবি করেন যে পুরুষের মতই নারীর অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সম অধিকার দাবি করে। নিসর্গনীতি মানুষ ও প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের আলোচনায় নিয়োজিত। নারী-নিসর্গবাদ সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্ব নয়, এই চিন্তাধারা হল নারীবাদ ও নিসর্গনীতির সম্মিলিত রূপ, যেখানে মনে করা হয় পুরুষের দ্বারা নারীর অবদমন এবং মানুষের দ্বারা প্রকৃতির অবদমনের মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র আছে, উভয়েই পুরুষতন্ত্রের শিকার। তাই পুরুষতন্ত্রকে উৎখাত না করে নারী ও প্রকৃতির মুক্তি সম্ভব নয়।নারী-নিসর্গবাদ বা 'ইকোফেমিনিজম' পদটি প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রান্কস দে আইবোন (Francoise de Eaubonne) তাঁর লে ফেমিনিজম ঔ লা মর্ট (Le Feminism Ou La Mort,1984) বইটিতে।

নিসর্গ-রাজনীতিকদের একটি বিতর্ক লক্ষ্য করা যায় যাকে- 'ইন্টারনাল গ্রীন ডিবেট' বলা হয়। নিসর্গ-রাজনীতিকদের তিনটি দল লক্ষ্য করা যায়। এরা হল নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদী (Deep Ecologist), সামাজিক-নিসর্গনীতিবাদী (Social Ecologist) এবং নারী-নিসর্গনীতিবাদী (Ecofeminist)।

পুরুষতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি এক নাও হতে পারে। পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি নানাবিধ ও বিচিত্র হতে পারে, কিন্ত 'পুরুষতন্ত্র' এক সমরূপ তন্ত্রকে বোঝায়। এই তন্ত্রে পুরুষের মনন ও অভিজ্ঞতাতেই নারী ও পুরুষের আদর্শ অবস্থান কী হওয়া উচিৎ সেটাই নির্দেশিত ও নির্দিষ্ট হয়। একজন আদর্শ পুরুষের প্রতিরূপ যে যে গুণের দ্বারা নির্মিত হয়, আদর্শ নারীর প্রতিরূপ নির্মিত হয় তার বিপরীত গুণের দ্বারা। পুরুষকে দেওয়া হয় সৃষ্টির অধিকার, শক্তির আসন, সমাজ পরিচালনার অধিকার, তত্ত্ব সৃষ্টির অধিকার। সে হল সব 'তত্ত্বের' জনক, তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে তত্ত্ব গড়ে ওঠে তাকেই একমাত্র বৈধ তত্ত্ব ও যৌক্তিক মত বলা হয়। যৌক্তিক বলেই এই তত্ত্ব লিঙ্গরহিত গ্রহণযোগ্য মত বলে দাবি করা হয়। আর নারীর জন্য বরাদ্দ প্রাণপালন, প্রাণসৃষ্টি, আবেগ, সমর্পণাদির ভূমিকা। এই তন্ত্রে দাবি করা হয় যে প্রাণপালন, প্রাণসৃষ্টির ক্ষমতা, আবেগ, প্রেম-ভালবাস প্রভৃতি গুণগুলি মনন ও চিত্তের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে যুক্ত নয়, এগুলি কেবলমাত্র নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্টের সঙ্গে যুক্ত। যদি কোন পুরুষ সমর্পণের ভূমিকা পালন করে তাকে 'মেয়েলি-পুরুষ' বলা হয়, আর নারী শক্তি প্রদর্শন করলে সে 'পুরুষালি-নারী' রূপে বিবেচিত হয়। পুরুষতন্ত্রে কেবলমাত্র পুরুষকেই শক্তির অধিকারী করে তার হাতে তুলে দেয় সভ্যতা সৃষ্টির চাবিকাঠি আর নারীর জন্য প্রানপালন, প্রানসৃষ্টির মত সামাজিক গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়, শক্তিতে তার নাই অধিকার, সমাজে ক্ষমতাহীন সদস্যরূপে চিরায়ত পরিচয় তার আজও। তাই এখানে নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়াস প্রতিপদে বিঘ্নিত হয়।

নারীর অধিকার রক্ষার্থে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী: নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে পুরুষতন্ত্র সর্বদাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পুরুষতন্ত্র একনায়ক তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, এখানে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। শোষণ, দমন, পীড়ন, হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতির দ্বারা মানুষ ধংসকারী যুদ্ধকে আহব্বান জানায়। তত্ত্ব, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য সবই পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পুষ্ট। অর্থাৎ পুরুষ যে চোখে জগতকে দেখে সেটাই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী। সুপরিকল্পিতভাবে নারীকে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সতীত্ব প্রমাণে সীতার অগ্নি পরীক্ষা, মৃত স্বামীর চিতায় সতীকে দহন, নারীকে ভোগ্যবস্তু রূপে উপস্থাপন ইত্যাদি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম উদাহরণ। তাই জগতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীবাদের একটি অন্যতম বিকল্প হল যে পুরুষতন্ত্রের পরিবর্তে স্ত্রীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। স্ত্রীতন্ত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে লালন-পালন, পেম-ভালবাসা, মৈত্রী ইত্যাদি মন্ত্রে সবাই দীক্ষিত হবে। পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে যে মননের যোগ সুপ্রতিষ্ঠিত তার পরিবর্তে নারীর সংবেগ শক্তিকে চালিকা শক্তির আসনে বসালে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নে আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। নারী-নিসর্গবাদীরা বলেন পুরুষতন্ত্রে পুরুষকে কেন্দ্রে রেখে নারীকে প্রান্তে রাখা হয়। কেন্দ্রে অবস্থিত সদস্যের স্বার্থে প্রান্তে অবস্থানকারী সদস্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। স্ত্রীতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে নারীকে কেন্দ্রে রেখে পুরুষকে প্রান্তে রাখা হবে। নারী ও পুরুষ- এই দ্বিকোটিক অবস্থানেই নারী-নিসর্গবাদের আপত্তি। তারা বলেন যে পুরুষতন্ত্র যেমন পুরুষের দিকে ঝোঁকে, নারীতন্ত্র তেমন নারীর দিকে ঝোঁকে। অন্য একটি বিকল্প হল অন্তর্ভূক্তির প্রকল্প। এই মতে বলা হয় যে সুযোগ ও সহযোগিতা পেলে নারী নিজেকে পুরুষের মতই যোগ্য করে তুলতে পারে। পুরুষের মতই নারী বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি সৃষ্টি করতে পারে। এই মতানুসারে নারীমুক্তি মানে প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালন, জৈবিকবৃত্তি প্রভৃতি থেকে মুক্তি লাভ করা এবং পুরুষ তন্ত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। এদের মতে নারীকে তার নারীসুলভ স্বভাব সরিয়ে রেখে পুরুষের মত করে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। শারীরবৃত্তিকে গৌণ করে মননকে মুখ্য করতে হবে। প্রয়োজনে নারীকে জৈবিক বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে বিঞ্জান, সাহিত্য, শিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতির সাহায্য নিতে হবে। অর্থাৎ নারীকে আরও বেশি করে মানুষ হতে হবে এবং সেটা পুরুষতান্ত্রিক অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব। নারী-নিসর্গবাদীরা বলেন যে যদি পুরুষতন্ত্রের সব দোষ মেনে নিয়ে স্ত্রীসুলভ বা নারীসুলভ গুণ যথা প্রাণপালন, প্রাণসৃষ্টির ক্ষমতা, আবেগ, প্রেম-ভালবাস প্রভৃতি গুনগুলি পরিহার করে পুরুষতন্ত্রে প্রবেশ করা হয় তাহলে তা একই সাথে নারীর অবমাননা ও মানব সভ্যতার পক্ষে অমঙ্গলজনক।

নারী ও প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপনে নারীনিসর্গবাদীদের বিরোধিতা: নারীনিসর্গবাদীরা মনে করেন পিতৃতন্ত্রের চিন্তাভাবনার সঙ্গে ফ্রয়েডিও মনস্তাত্তিক বিচার ওতপ্রতভাবে যুক্ত। পিতৃতন্ত্রের সমর্থকরা মনে করেন প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ

ব্যাক্তি স্বনির্ভর ও স্বতন্ত্র। সম্পূর্ণ মানসিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে না পারলে নারী বা পুরুষ কারোরই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। নারীনিসর্গবাদীরা বলেন যে স্বনির্ভর হয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারণার মধ্যেই ভুল আছে। কারণ কেউই স্বতন্ত্র বা স্বনির্ভর নয়, পরস্পরের উপর নির্ভর করেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় নারীসুলভ গুণ পুরুষের আছে এবং পুরুষসুলভ গুণ নারীর আছে। পুরুষতন্ত্রে বলা হয় নারী ও প্রকৃতির মধ্যে ভেদ কম, পুরুষের সাথে প্রকৃতির ভেদ তাঁর থেকে বেশী। এখানে পুরুষ-নারী, মানুষ-প্রকৃতি, মানসিক -শারীরিক, সূক্ষ-স্থুল প্রভৃতি জুটির মধ্যে বিভাজন করা হয় এবং জুটির প্রথম পক্ষটি উৎকৃষ্ট ও দ্বিতীয় পক্ষ নিকৃষ্ট। ফলে প্রথমটির দ্বিতীয়টিকে অবদমন করার নৈতিক অধিকার আছে। নারীনিসর্গবাদীরা (Ecofeminist) একটি জুটির দুটি পক্ষের মধ্যে বিভাজন স্বীকার করেন কিন্ত তারা বিভেদ স্বীকার করেন না। তারা বলেন প্রথম পক্ষটি দিতীয় পক্ষ থেকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়। কারণ একটি জুটির একটি পক্ষ দুর্বল হলে জুটিটাই দুর্বল হয়ে পড়বে। তাছাড়া কোন পক্ষ দুর্বল হলেও অপর পক্ষের তাকে শাসন ও নিপীড়ন করার অধিকার জন্মায় না। তাই একটি জুটির কোন পক্ষকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বলা উচিৎ নয়। পুরুষতন্ত্রই বিভিন্ন পক্ষগুলিতে পৃথক পৃথক মূল্য আরোপ করতে শেখায়।

সামাজিক নিসর্গনীতিবাদীদের (Social Ecologist) অন্যতম প্রবক্তা মারে বুকচিন, তার মতে মানুষ অন্যান্য জীবজগত, উদ্ভিদ জগত প্রভৃতিকে দমন ও নিপীড়ন করে পরিবেশকে দূষিত ও ধ্বংস করে। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি এই নিপীড়নের উৎস মানব সমাজেই সুপ্তভাবে লুকিয়ে আছে। কারন মানুষ একে অপরকে দমন, নিপীড়ন, হিংস্, ঘৃণা ও অবহেলা করে এবং এই দমন-নিপীড়ন প্রবণতাই নিসর্গের প্রতি প্রসারিত হয়। বুকচিনের মতে সামাজিক স্তরে মানুষ মানুষকে শোষণ করে, আর অন্য স্তরে মানুষ প্রকৃতিকে শোষণ করে। মানুষেরই রয়েছে যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা আর এই জন্য সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ হল যুক্তিবুদ্ধি সম্পন্ন জীব। সমাজে বৈষম্যমুলক আচরণ দূর করে যৌক্তিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে আবেগ, মমতা, সহানুভূতি প্রভৃতির মূলেই যুক্তির স্থান করে দিতে হবে। বুকচিনের মতে যুক্তির জন্যই মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও ক্ষমতাশালী জীব হিসাবে পরিগনিত। নারীনিসর্গবাদীরা বুদ্ধিবৃত্তি বা যুক্তিবৃত্তির সাথে ক্ষমতাশালীর কোন আবশ্যিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন না এবং যুক্তির অধিকারী হওয়ার কারনে মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলতেও তারা নারাজ। এদের মতে যুক্তির ভিত্তিতে সব কিছুকে পরিচালনা করার মধ্যে একধরনের যুক্তির সাম্রাজ্যবাদী মনস্কতা বিদ্যমান। এই কারনেই সামাজিক-নিসর্গবাদের মূলে পিতৃতান্ত্রিক প্রেক্ষিত কাজ করে চলেছে।

নিবিড়-নিসর্গবাদ (Deep Ecology) বা 'ডীপ-ইকোলজি' পদটি প্রথম ব্যবহার করেন আরনে নেস (Arne Naess) তাঁর 'দ্য শ্যালো অ্যান্ড দ্য ডীপ লঙ রেঞ্জ ইকোলজি মুভমেন্ট' (The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement) প্রবন্ধে (১৯৭৩)। নিবিড়-নিসর্গবাদীরা মনে করেন যে মানুষের যেমন স্বকীয় মূল্য বা স্বগত মূল্য আছে তেমনই অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদেরও স্বকীয় মূল্য আছে। নৈতিক অধিকার কেবল মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পরিবেশ প্রকৃতিরও নানা অধিকার আছে। যেমন পশু- পাখি, গাছ, সবারই টিকে থাকা, অত্যাচারিত না হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। মানুষকে সমস্ত কতৃত্ব, অহংকার, হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতি ত্যাগ করে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন মানসিক স্তরে পরিবর্তন। আধ্যাত্মিক উত্তরণের মাধ্যমে মানসিক স্তরে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তবে নিবিড়-নিসর্গবাদীরা নিসর্গ প্রকৃতির স্বকীয় মূল্যের কথা বলেন, অথচ পুরুষতন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে সমাজকে ঢেলে সাজাবার তাগিদ অনুভব করেন না। পিতৃতন্ত্রের চিন্তা কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন। ফলে যেখানে পিতৃতান্ত্রিক প্রেক্ষিত বর্তমান সেখানে কীভাবে নিসর্গ প্রকৃতির স্বকীয় মূল্য প্রকৃতার্থে স্বীকৃত হবে ?

নিসর্গনীতির সমস্যাটি মূলত 'নিসর্গ-ন্যায়'(Eco-Justice) সম্পর্কিত সমস্যা যার সমাধান একমাত্র রাজনৈতিক উপায়েই সম্ভব। এই জন্য একই সাথে প্রকৃতির সাথে মানুষের সর্ম্পক ও পুরুষের সাথে নারীর সর্ম্পকের নববিন্যাস ঘটাতে হবে।কারণ পুরুষের দ্বারা নারীর অবদমন এবং মানুষের দ্বারা প্রকৃতির অবদমন- এই দুটি সমস্যাকে আলাদা

করে সমাধান সম্ভব নয়, এরা পরস্পর ওতপ্রতভাবে যুক্ত। পুরুষের দ্বারা নারীর ও মানুষের দ্বারা প্রকৃতির অবদমনের মূলে রয়েছে এক ধরণের নিপীড়নমূলক ধারণাগত পরিকাঠামো। একটি অবদমনমূলক ধারণাগত পরিকাঠামো বলতে আমরা বুঝি সেই চিন্তাধারাকে ব্যাখ্যা করে, যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে এবং সেগুলিকে ধারণ করে চলে। নিপীড়নমূলক ধারণাগত পরিকাঠামোর তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে- ১) মূল্যবিন্যাসগত উচ্চ-নীচ চিন্তা (value-hierarchical thinking), যা মূল্যমানের উপরের দিকে অবস্থান করে তাকে বেশীমূল্যবান মনে করে এবং যা নিচের দিকে অবস্থান করে তাকে কম মূল্যবান মনে করে। ২) মূল্যগত দ্বৈতবাদ (value dualism), যেখানে বৈকল্পিক যুগলকে পরস্পর পরিপূরক না ভেবে পরস্পর বিরোধী ভাবা হয়। যেমন- দেহের তুলনায় মনকে, আবেগের তুলনায় যুক্তিকে, নারীর তুলনায় পুরুষকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। ৩) প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তি (the logic of domination) এটি অবদমন-নিপীড়নের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে ব্যবহার করা হয়। এই অবদমনের যুক্তিটি একই সাথে মানুষের দ্বারা প্রকৃতি এবং পুরুষের দ্বারা নারীর অবদমনের যৌক্তিকতা নিঃসৃত করে। মানুষের দ্বারা প্রকৃতির অবদমনের যুক্তিটি এইভাবে সাজানো হয়- ১) মানুষ যে পরিবেশে বাস করে তার পরিবর্তন সে ঘটাতে পারে, গাছপালা, পাথরাদি তা পারে না। ২) সচেতনভাবে পরিবেশ বা সমাজের পরিবর্তন ঘটানোর সামর্থ্য যার আছে সে যার এই সামর্থ্য নেই তার থেকে নৈতিকভাবে উৎকৃষ্ট। ৩) সুতরাং মানুষ গাছপালা বা শিলাপাথরের থেকে নৈতিকভাবে উৎকৃষ্ট। ৪) যে কোন x বা y এর ক্ষেত্রে যদি x y এর তুলনায় নৈতিকভাবে উৎকৃষ্টতর হয় তাহলে x এর y কে অবদমন করার অধিকার আছে। ৫) অতএব মানুষের গাছপালা ও শিলাপাথরের উপর প্রভুত্ব করার অধিকার যুক্তিযুক্ত। একইভাবে পুরুষের দ্বারা নারীর অবদমন নিঃসৃত হয় এইভাবে- ১) নারী প্রকৃতি তথা ভৌতজগতের সঙ্গে অভিন্ন বিবেচিত হয়, পুরুষ মানুষ তথা মানুসিক দিকের সঙ্গে অভিন্ন বিবেচিত হয়। ২) কোন সত্তা যা প্রকৃতি তথা ভৌত জগতের সঙ্গে অভিন্ন বিবেচিত হয় তা যা কিছু মানবপম তথা মানসিক তার তুলনায় নিকৃষ্ট। ৩) সুতরাং নারী পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট। ৪) যে কোন x এবং y এর ক্ষেত্রে যদি x y এর তুলনায় উৎকৃষ্ট হয় তাহলে x y কে অবদমিত করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত। ৫) অতএব নারীকে অবদমিত করার ব্যাপারে পুরুষ যুক্তিযুক্ত। উপরোক্ত যুক্তিদুটির দ্বারা একই সাথে পুরুষের দ্বারা নারীর ও মানুষের দ্বারা প্রকৃতির অবদমন প্রতিপাদিত হয়।

সব নারীবাদীই প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তিটির বিরোধিতা করে। এরা বলেন অবদমনমূলক ধারানাগত পরিকাঠামো পুরুষকে উচ্চে স্থান দেয়, আর নারীকে পুরুষের অধীন করে। নারীনিসর্গবাদীরা মানুষের দ্বারা প্রকৃতির অবদমনকে পুরুষের দ্বারা নারীর অবদমনের অংশ হিসাবে দেখে এবং অবদমনমূলক ধারানাগত পরিকাঠামোর বিরধিতা করে। এদের মতে মানবকেন্দ্রিকতার সাথে একই সঙ্গে পুরুষকেন্দ্রিকতাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে। এরা বলেন যে নিসর্গ-ন্যায়ের ভাগ বণ্টনে প্রকৃতি যেমন নিষ্ক্রিয় দাবীহীন শরিক নয় তেমনি সংস্কৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রটিতেও পুরুষ ও নারী উভয়ের ভুমিকা সমান। প্রকৃতি, পুরুষ, নারী এঁরা কেউই স্বতন্ত্র নয়, সকলেরই দায়িত্ব পালন করতে হয়- কখনও এককভাবে আবার কখনও কখনও যৌথ ভাবে। তবে কোন এককালে বসে সর্বকালের জন্য এদের অধিকারের সীমানা বা দায়িত্ব বণ্টন সম্ভব নয়, সময়ের সাথে সাথে অধিকারের সীমানা বদলাতে পারে। এঁরা আরও দাবী করেন যে সমাজে যেমন বিবিধ সদস্য আছে এদের গুণও তেমন বিবিধ। এরা নিজেদের স্বকীয়তা বর্জন করতে রাজী নয়, তাই সমাজের বহুবিধ সমস্যার একরৈখিক সমাধান দিয়ে তাদের সমস্যা দূর করা যায় না। নারী-নিসর্গবাদীরা মনে করেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর নিজের মত করে সুখ দুঃখের উপলব্ধি ব্যক্ত করতে দেওয়া উচিৎ, এবং বহুতত্ত্ব ও বহু ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমস্যার সুষ্টু সমাধান সম্ভব। মানুষ আবশ্যিক ভাবে একে অপরের সঙ্গে ও নিসর্গের সাথে সম্পর্কিত- এই সম্পর্কগুলি সামাজিক নির্মাণের ফসল তা আপতিক নয়। সমাজকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু বদলানো যায়। একমাত্র দরদ থাকলেই ক্ষমতার তারতম্য ও বিভেদ থাকা সত্ত্বেও দুর্বলকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকতে পারব। নারী-নিসর্গবাদীরা দরদ বা কেয়ার, প্রেম, ভালবাস, আস্থা প্রভৃতি নৈতিক গুনগুলি সমর্থন করেন এবং তারা বলেন এই নৈতিক গুনগুলি সৃজিত, জন্মায়ত্ত নয়।

প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অপরাপর ব্যক্তি ও নিসর্গের সাথে সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। মানুষ, অন্যান্য জীব, উদ্ভিদ সবাই আদি থেকেই পরস্পর নির্ভরশীল। এবং বহু জনের অভিজ্ঞতা ও বোধ দিয়ে উদ্ভূত সমস্যগুলি বুঝতে হবে ও সেই অনুসারে সামাজিক নিয়মনীতি গুলি প্রণয়ন করার মধ্য দিয়েই ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ ঠেকানো সম্ভব হবে এবং দূষণহীন সুস্থ পরিবেশ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা সুন্দর সমাজ গঠন করতে পারব যেখানে হিংসা, ঘৃণা, অবদমন, শোষণ, অত্যাচার থাকবে না, কেবল থাকবে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। তবে এটা দীর্ঘমেয়াদী লড়াই, এত দিনের চিন্তা-ভাবনার সংস্কার পরিবরতন করতে সময় লাগবে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, ক.(২০১১). নারী শ্রেণী ও বর্ণঃ নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান. কলকাতাঃ মিত্রম.
২। বড়ুয়া, সু. লা.(২০১১). নারীর পৃথিবী নারীর সংগ্রাম. কলকাতাঃ রাডিক্যাল.
৩। মৈত্র, শে.(২০০৯). নৈতিকতা ও নারীবাদঃ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা. কোলকাতাঃ নিউ এজ পাবলিসার্শ প্রাইভেট লিমিটেড.
৪। পাল, স. কু.(২০১২). ফলিত নীতিশাস্ত্র (প্রথম খণ্ড). কলকাতাঃ লেভান্ত বুকস.
৫। সিংহ, ক.(২০০৫). মনুসংহিতা এবং নারী. কলকাতাঃ রাডিক্যাল.